আমি ও সে

সুশান্তকুমার বিশ্বাস

লিইবার ফিয়েরা

সে যেন আসে না ১০
শোনো, কোনও একদিন ৫৯
কোন সে আলোর স্বপ্ন ১০৫

সে যেন আসে না

রানাঘাট সদর হাসপাতালে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনটা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে আছে। বাবার হাজারও অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে বিরত করেছিলাম আমার সঙ্গে যেতে। তাঁর যুক্তি ছিল যে আমি মাত্র চব্বিশ বছরের তরুণী, যে কিনা প্রায় হাঁটা পথেই স্কুল-কলেজ যাতায়াত করেছি, তাকে লোকাল ট্রেনের শ্বাসরোধ করা ভিড়ে যাতায়াত করতে হবে রোজ এবং তারপর আবার গিয়ে গণ্ডাগণ্ডা রুগি দেখতে হবে। তাই তিনি আমার সঙ্গে যান অথবা রানাঘাটেই সদর হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডক্টর-এর কোয়ার্টারে থেকে যাই। বাবাকে কোনোক্রমে শান্ত করলাম এই বুঝিয়ে যে আগে তো জয়েন করি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কৃষ্ণনগর লোকালে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। তার মধ্যেই কোনোরকমে ঠেলে ঢুকে পড়লাম আর সঙ্গে সঙ্গেই সংকল্প করে ফেললাম যে বাবার কথা অনুযায়ী কোয়ার্টারেই থাকতে হবে। এই গা ঘিনঘিনে ভিড়ে রোজ যাতায়াত করতে থাকলে আমি খুব শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব। কপাল ভাল, কিছুক্ষণ অসভ্যভাবে লোকের গায়ে লেপটে থাকার পরে অনেক কষ্টে, একজন প্রবীণের বদান্যতায়, বসার জায়গা পেলাম, তাও আবার জানালার ধারে। মুহূর্তেই এতক্ষণের ভিড়ে পিষ্ট হওয়ার গ্লানি ভুলে গেলাম। তখন ঘোর বর্ষাকাল। দু'ধারের মাঠে সবুজ ধানের সমারোহ। দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। রানাঘাট স্টেশন আসতে আসতে ভিড় অনেকটা হালকা হল। নামার সময় আর যুদ্ধ করতে হল না।

স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিয়ে সদর হাসপাতাল পৌঁছোলাম। সুপারিন্টেনডেন্ট ডাক্তার মনোজ অধিকারী আপ্যায়ন করে বসালেন দেখে একটু অবাক হলাম বইকি। বললেন, "দেখছেন তো সদর হাসপাতালের অবস্থা। তার উপর সবকিছুই নেই নেই। প্রাইমারি প্রেসক্রিপশনের ওষুধগুলো

চাইলেই পাবেন না, সেকেন্ডারি প্রেসক্রিপশনের ওষুধের কথা ছেড়েই দিলাম। সার্জারির জিনিসপত্র পাবেন না, কিন্তু তা বলে অপারেশন করব না এ কথা বলা যাবে না কিন্তু। স্যালাইন নেই, অক্সিজেন সময় মতো আসে না, এক্স রে মেশিন মাঝে মধ্যেই খারাপ...” তাঁকে হাত তুলে থামালাম। অল্প হেসে বললাম, “এগুলো সব আমার জানা স্যার। কিন্তু এর মধ্যেই তো কাজ করে যেতে হবে। আপনি ভাববেন না। আমি এসব নিয়ে আপনার কাছে অভিযোগ জানাতে আসব না।” “বাহ্, দ্যাটস ভেরি গুড। তাহলে বলুন আমি আর কী করতে পারি?” আমি বললাম, “সে কথায় পরে আসছি। আগে বলুন আমি আর আপনি ছাড়া এখানে আর ক’জন ডাক্তার আছেন?” সুপারিন্টেনডেন্ট ডাক্তার মনোজ অধিকারী একটু ভেবে বললেন, “সংখ্যায় আরও দু’জন, কিন্তু তাদের কাজে পাবেন না।” আমি অবাক হয়ে বললাম, “ঠিক বুঝলাম না।” সুপারিন্টেনডেন্ট বললেন, “একজন, ডাক্তার সুজন মুখোপাধ্যায়, কোনোরকমে এখানে বুড়ি ছোঁওয়া করেই কাছের প্রাইভেট চেম্বারে কেটে পড়েন উপরি রোজগারের জন্য।” আমি হেসে বললাম, “ভাল কথা। অপরজন?” “অপরজন, ডাক্তার অরিজিৎ সরকার। অর্ধ-উন্মাদ। ইচ্ছে মতো আসে যায়। কিছু বলেও লাভ হয় না।” একটু থেমে সুপারিন্টেনডেন্ট ডাক্তার মনোজ অধিকারী বললেন, “সুতরাং ওই আমাকে আর আপনাকে দিয়েই চালাতে হবে।”

আমার স্মৃতিতে কী যেন খেলে গেল। বললাম, “আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে এই অরিজিৎ সরকারই প্রথমবারের উচ্চ-মাধ্যমিকে সায়েন্সে টপার হয়েছিল।” সুপারিন্টেনডেন্ট একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “তা বলতে পারব না ভাই, কিন্তু এই অর্ধ-উন্মাদকে দিয়ে আর যা-ই হোক হাসপাতাল চালানো যায় না।” আমি হেসে বললাম, “কেন, কী পাগলামি করেন?” “কী করেন না তাই বলুন! নার্সরা আমাকে রিপোর্ট করেছেন যে খুব গরমের দিনে খালি গায়ে আউটডোরে এসে, গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে রুগি দেখছেন।” আমি মৃদু মৃদু হাসতে থাকলাম। সুপারিন্টেনডেন্ট ডাক্তার মনোজ অধিকারী বললেন, “আরও আছে। ইমারজেন্সিতে অপারেশন চলাকালীন হঠাৎ স্ক্যালপেল, সিজরস নামিয়ে রেখে বলেন, ‘নাহ্, একটু চা না খেলে ঠিক মুড আসছে না।’” আমি, “সে কী!” বলে আঁতকে উঠেও হেসে ফেললাম। মনোজ অধিকারী বললেন, “এখন আপনার শুনে

শোনো, কোনও একদিন

১

একটা দিন বদলের গান শুরু করতে গেলে যে কুশীলবদের প্রয়োজন, তা কিন্তু আমার হাতে নেই। এখানে দু'টি মাত্রই মৌলিক চরিত্র— অনিকেত আর বেকি, ওরফে বেলেন। অনিকেত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা পরিভাষায় ভিসুয়্যালি ইমপেয়ারড। কিন্তু এটুকু বললেই বলাটা যথেষ্ট হয় না। অনিকেতের প্রতিবন্ধকতার ডাক্তারি নাম সিভিআই বা সেরিব্রাল ভিসুয়্যাল ইমপেয়ারমেন্ট। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সেরিব্রাল ভিসুয়্যাল ইমপেয়ারমেন্ট কিন্তু সরাসরি চক্ষু সংক্রান্ত অক্ষমতা নয়। এখানে ব্যাধিটি আসলে মস্তিষ্কের। তাই প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দু'টি কর্নিয়া এবং রেটিনা থাকা সত্ত্বেও অনিকেত যা দেখতে পায় তা হল এক রঙিন ধুলোর ঝড়।

অনিকেতের জন্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে। তার বাবা অনিরুদ্ধ বাগচি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি, পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিম বাংলার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক পাশ করে স্নাতকোত্তর করতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তারপর ওই শহরেরই একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি নেন। অনিকেতের মা এঞ্জেলিনা গ্রিন শিকাগো শহরেরই এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের মেয়ে। উচ্চশিক্ষিত এবং ওই একই বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করতেন। চাকরি জীবনের ওঠা-বসার মধ্যেই দু'জনের ঘনিষ্ঠতা, প্রেম ও বিবাহ। তাঁদের বিবাহের তৃতীয় বর্ষে অনিকেতের জন্ম।

জন্মকালে অনিকেত ছিল অকালজাত শিশু বা পরিভাষায় প্রিম্যাচিওরড বেবি। সে যখন শিকাগো স্টেট জেনারেল হসপিটালে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে মায়ের গর্ভে মাত্র আটমাস-সতেরোদিন অতিবাহিত করেছে। তার অতিস্বল্প

শারীরিক ওজন এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির অনুন্নত অবস্থার কারণে শিকাগো স্টেট জেনারেল হসপিটালের সদ্যোজাত বিভাগের ডাক্তাররা এ শিশু শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কি না তা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে, ডাক্তার এবং নার্সদের তিনমাসব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, অনিকেত প্রথম জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়।

অনিকেতের মায়ের মুখে সে যাত্রায় হাসি ফুটলেও তার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শারীরিক অসঙ্গতি, বিশেষ করে স্নায়ু সংক্রান্ত অসঙ্গতি ধরা পড়তে থাকে। অনিকেতের সবচেয়ে বড় শারীরিক সমস্যা, যেটা তার বাবা-মায়ের মর্মবেদনার কারণ হয়ে ওঠে তা হল মৃগীরোগ বা এপিলেপটিক ডিসঅর্ডার। খুব অল্প কথায় বলতে গেলে তিন বছর বয়স থেকে শিশু অনিকেত হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানির মতো তীব্র আলোর রোশনাই দেখতে পেত এবং তারপর সারা শরীরে প্রবল কাঁপুনি হওয়ার পরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। অনিকেতের মায়ের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ আত্মীয়স্বজন মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন যে এ স্রেফ ভূতে ধরা এবং ভুডু বা প্রেতচর্চা ছাড়া এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। অনিকেতের মা-বাবা কিন্তু তাঁদের নিজ-নিজ শিক্ষা এবং ডাক্তারদের পরামর্শের ওপরই ভরসা রেখেছিলেন।

সুতরাং ভুডু ও প্রেতচর্চা থেকে বহু দূরে সরে এসে তাঁরা অনিকেতের শরীর এবং মনের প্রকৃত বিকাশের ওপর জোর দেন। শরীর এবং মনের বিকাশ অনিকেতকে একটা গ্রহণযোগ্য স্বাভাবিকতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এমনকী, দীর্ঘ সময়ের স্নায়ু চিকিৎসা তাকে ক্রমশ মৃগীরোগ বা এপিলেপ্টিক ডিসঅর্ডার থেকে প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নিয়ে আসে। কিন্তু বিদ্যুতের ঝলকানির মতো তীব্র আলোর রোশনাই তার দৃষ্টি থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় অন্য একটি সমস্যা। ক্রমশ তার চোখ জগতকে দেখার স্বাভাবিক শক্তি হারাতে থাকে। সাত বছর বয়স থেকে তার দৃষ্টিতে সামনের মানুষ বা বস্তু ক্রমশ ঝাপসা থেকে আবছা এবং তারপর সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে, বারো-তেরো বছর বয়সে যা অবশিষ্ট থাকল তা হল একটা রঙিন ধুলোর ঝড়।

এরপর আরও একটি দশক পেরিয়ে গিয়েছে। অনিকেত এখন তেইশ

কোন সে আলোর স্বপ্ন

ইংরেজি ডিকশনারি বা বাংলা অভিধান আমার বড় প্রিয়। দুটোই আটশো থেকে হাজার পাতার; মানে বেশ আয়েশ করে অনেকদিন ধরে পড়া যায়। তা ছাড়া কত অসংখ্য শব্দ, তাদের আবার বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়, কিম্বা পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, আরও কত কী। আমার পড়তে খুব ভাল লাগে। আর ওগুলো মনে রাখার সুবিধা হল দিদির ডেসারটেশান লেখার সময় কোনও ইংরেজির বাংলা প্রতিশব্দ অথবা বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দের প্রয়োজন হলে ইংরেজি ডিকশনারি বা বাংলা অভিধান দেখতে হয় না। আমিই বলে দিই। আগে, কারোর দরকার পড়লে টেলিফোন ডিরেক্টরিটা আর ঘাঁটতে হত না। আমিই বলে দিতাম। এখন অবশ্য মোবাইল ফোনের যুগ। সার্চ মোডে গেলেই আমার চেনা মানুষটির নম্বর খুঁজে নেওয়া যায়। আমি তাই টেলিফোন ডিরেক্টরি ছেড়ে ইংরেজি ডিকশনারি বা বাংলা অভিধানেই মনোনিবেশ করেছি।

আমি অত্রি; অত্রি রায়চৌধুরী। আমরা এক ভাই আর এক বোন। আমার দিদি অঙ্কিতা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। দিদি এখন তার পিএইচডি নিয়ে ব্যস্ত। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আমার বাবা কর্কট রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর অবর্তমানে আমার বাবার বিরাট ব্যবসা দেখাশুনো করেন তাঁর বাল্য বন্ধু এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পার্টনার মণিমোহন সিকদার, মানে আমাদের মণি কাকা। আমাদের বাড়ি বিবেকানন্দ রোড নামের একটি অতীব ব্যস্ত রাস্তার উপর। অসংখ্য গাড়ি, ভারী ভারী লরি আর বড় বড় বাস এই রাস্তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে সারাদিন, সারারাত। বড্ড শব্দ হয়। এত শব্দ আমার ভাল লাগে না। বুকের ভিতর কেমন ধড়ফড় করে। মাকে অনেকবার বলেছি, "চলো আমারা একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে থাকি।" কিন্তু মা রাজি নয়, দিদিও রাজি নয় কারণ দিদির বিশ্ববিদ্যালয়

এখান থেকে খুব কাছে। আমার মামার বাড়িও এখান থেকে খুব কাছে। ওদের কী করে বোঝাই যে আমার কেমন জানি দমবন্ধ লাগে, কষ্ট হয়। বিকেলবেলায় রোদের তেজ কমে এলে মা অবশ্য আমাকে নিয়ে ছাদে যান। কিন্তু যানবাহনের শব্দ আমাদের বাড়ির পাঁচতলার ছাদেও আমাদের পিছু ছাড়ে না।

আমি ছ'বছর বয়স থেকে স্পেশালি-এবল্ড বাচ্চাদের স্কুলে যাচ্ছিলাম। তবে এখন আর যাই না কারণ ওখানে যা শেখার ছিল তা অতি সীমিত এবং আকর্ষণহীন। আমি দু'তিন বছরেই শুধু আঁকার আর কম্পিউটারের ক্লাসটি ছাড়া বাকি সব ক্লাসের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কম্পিউটার আমার বড় প্রিয়। কম্পিউটারের সামনে বসে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। উদ্ভিদদের প্রকারভেদ, জীবজগতের বৈচিত্র্য, সমুদ্রের নীচে থাকা আরেক রহস্যময় পৃথিবী সম্পর্কে কত তথ্য রয়েছে সেখানে। আমি বুঁদ হয়ে তা পড়ি, নানা রকমের ছবি দেখি আর ভাবি যারা ওইসব তথ্য ও চিত্রকে ক্যামেরাবন্দি করে আনছে, তাদের মতো যদি হতে পারতাম! যদি প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের বাসায় গিয়ে ওর ছানাটাকে আমার হাতের তালুতে তুলে নিতে পারতাম! যদি ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ বা পিচার প্ল্যান্টের ঝোপে গিয়ে বসে থাকতে পারতাম! যদি ডুবুরি হয়ে মারিয়ানা ট্রেঞ্চে পৌঁছে যেতে পারতাম!

না, না, আমি জানি তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আমি শুধু যাকে বলে স্বপ্নবিলাসী। আমার এ স্বপ্নগুলো এসব স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তব হবে না কারণ আমি ফিজিক্যালি আন্ডার ডেভালাপড। এই সরু সরু হাত-পা, এই অনানুপাতিক মাথা, এই কুঁকড়ে যাওয়া বুকের খাঁচা, এতে এত জোর কোথায় যে আমি পথের চিন্তা না করেই পদব্রজে বিশ্বভ্রমণে নামব! আমি তাই নিজের মনোজগতেই বসবাস করি আর স্বপ্নের জাল বুনে যাই। সে স্বপ্নরা সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পেরিয়ে ভেসে যায় বহুদূরের এক আলোর দেশে।

মণিকাকা আমাকে অনেক কম্পিউটার গেমসের সিডি দিয়েছেন। প্রথম দিকের সিডিগুলো ছিল গাড়ি বা বাইক রেসের, যেগুলো দারুণ এক্সাইটিং। কখনও সেই রেসগুলো গ্রাঁ-প্রির মতো স্টেডিয়ামের রেস ট্র্যাকে হয়, আবার কখনও তা র‍্যালির মতো হাইওয়ে দিয়ে। কয়েকমাস খেলার পরে অবশ্য